শিল্পায়ন বিষয়ক গবেষণা

শফিক উজ জামান*

ভূমিকা

শিল্পায়নের উপর গবেষণা অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনীতিতে শিল্পের অধিক গুরুত্বের কারণেই এর গবেষণার পরিধিও অনেক বিস্তৃত। প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অংসখ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (Firm), কর্ম পদ্ধতি, আন্ত-সম্পর্ক, উৎপাদন-উপাদান অনুপাত, বাজার, ইত্যাদির সঠিক তথ্যানুসন্ধান যেমন দূরুহ তেমনি সময় সাপেক্ষ। তা ছাড়াও বৃহৎ শিল্পের বাৎসরিক উপাত্ত থাকলেও ক্ষুদ্র শিল্পের নাই অথচ শিল্পায়নের জন্য উদ্যোক্তা, উদ্যোগ, ব্যয়, প্রশিক্ষণ, কাঁচামালের উৎস, উৎপাদন, পণ্যের মান নির্ণয়, প্রতিযোগিতা, বিপনন, আয়, ব্যয় মূল্যায়ন এবং শিল্প-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা অনেক বেশী জরুরী। গবেষণা শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতই করবে না নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ছাড়াও আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতেও সাহায্য করবে।

শিল্পায়ন গবেষণা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও স্বাধীনতা উত্তর দুই দশকে শিল্পায়নের উপর তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নাই। বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প যা বাংলাদেশে কর্ম সংস্থান ও জি, ডি, পি,তে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে সেখানেও আজ অবধি উদ্যোক্তাদের শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারে তেমন গবেষণা নাই বললেই চলে। তবে স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্স"-এর অধীনে অধ্যাপক এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে শিল্প-উদ্যোগ এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের উপর একটি গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয়।[১] এই গবেষণায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও সমস্যা এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি তথা শিল্প-উদ্যোক্তাদের বৈশিষ্ট চিহ্নিত করে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক ও তাঁর সহযোগীদের এক গবেষণা গ্রন্থে[২] দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পপতিদের জীবন বৃত্তান্ত ও তাদের শিল্পায়নে তৎপরতার কথা উল্লেখ

*সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

করা হয়েছে যা শুধু নতুন উদ্যোক্তাদের আগ্রহই সৃষ্টি করবে না শিল্প বিষয়ক গবেষণায়ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ ছাড়াও "শিল্প উদ্যোগ পরিচিতি"[৩] এবং "শিল্প সম্প্রসারণম্যানুয়াল"[৪] –এ শিল্প বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা শিল্প গবেষণায় তথ্যের সীমাবদ্ধতা আংশিক হলেও কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। আলোচ্য প্রবন্ধে দেশের শিল্পায়ন গবেষণার বিভিন্ন দিক বিশেষ করে শিল্প–উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি, বাজার, ব্যবস্থাপনা, গবেষণার পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্পায়নের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিল্পায়নকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। কোন দেশে শিল্পায়নকে পশ্চাদপদ রেখে উন্নয়ন ঘটিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজতে যাওয়া বোকামী। একটি দেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি গণ্য করা হয়। শিল্পের বিকাশ শুধু মাত্র জনগণের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণ করে না, শিল্পের প্রসার শিল্প বর্হিভূত অপর গুরুত্বপূর্ণ কৃষি, সেবা ও বাণিজ্যের মতো খাতকেও সম্প্রসারিত করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো অতি জনবহুল দেশে শিল্পায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও দেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খাত। রপ্তানী আয়ে কৃষির অবদান প্রায় ৪০ ভাগ এবং মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৫৫ ভাগ এখনও কৃষিতে নিয়োজিত, কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরীকরণ তথা সামগ্রিক উন্নয়নে শুধুমাত্র কৃষিখাতের সম্প্রসারণ যথেষ্ট নয়। যদিও শিল্পের জন্য গুরুত্বপূণ শর্ত সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বাজারের সম্প্রসারণে কৃষির উন্নতি অপরিহার্য, কিন্তু কৃষির প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি একই গতিতে চলে না। মাহবুব হোসেন এক গবেষণায় দেখিয়েছেন[৫] শস্যউৎপাদন শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি পেলে কৃষিতে কর্মসংস্থান বাড়বে মাত্র শতকরা দেড় ভাগ হারে, অর্থাৎ প্রতি বছর নবাগত কর্মসন্ধানীদের মাত্র ২৮ ভাগ কর্মসংস্থান হবে।

বর্তমানে দেশের বেকারের সংখ্যা প্রায় ১·৪৫ কোটি। প্রতি বছর এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরো অতিরিক্ত দশ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষ। এই ক্রমবর্ধমান বিপুল বেকার মানুষের কাজের ব্যবস্থা করতে হলে শিল্পের বিকাশ ঘটানো অপরিহার্য। দেশে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির স্বল্পতা এবং ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার কারণেই ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন। কেননা ক্ষুদ্র শিল্প অল্প পুঁজিতে অধিক কর্মসংস্থান করে, মুনাফার হার অধিক, দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনা বেশী, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার দেশে বিরাজমান, বিদেশের উপর নির্ভরশীলতার হার কম।

শিল্পায়ন ও শিল্প উদ্যোগ গবেষণা

ঐতিহাসিকভাবেই আজকের বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর। যদিও ৬০–এর দশকেই কিছু কিছু উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে

স্বাধীনতার পরে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। এই শিল্প কারখানার অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত শিল্প। বাঙালী শিল্প মালিকদের অধীনে শিল্পের পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শ শিল্প কারখানা জাতীয়করণের পক্ষে ছিল। জাতীয়করণ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমর্থন লাভ করলেও শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কোন সুষ্ঠ নীতিমালা গৃহীত হয়নি। তাছাড়া জাতীয়করণকৃত এই বিপুল সংখ্যক শিল্প ইউনিটের পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মকর্তার অভাব ছিল প্রকট। কিন্তু তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারখানার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ। এই ক্ষেত্রে যোগ্যতার চাইতে রাজনৈতিক দল তথা বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে ব্যক্তিগত পছন্দ–অপছন্দই অধিক বিবেচ্য ছিল। এমনও দেখা গিয়েছে যে মালিকের কাছ থেকে মিল জাতীয়করণ করা হয়েছে তাকেই মিল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।[৬] এই সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির চাইতে জাতীয়করণ–এর ফলে তাদের লোকশান উশুলের লক্ষে কারচুপির দিকে নজর ছিল বেশী। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে এই সমস্ত কর্মকর্তা তহবিল তসরুফ, কারখানার যন্ত্রাংশ পাচার ও বিভিন্ন পথে সম্পদ আত্মসাৎ–এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানাকে দেউলিয়ায় পর্যবসিত করে নিজেরাই আবার জাতীয়করণের বিপক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। কাজেই স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্রের নামে শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করা হলেও মূলত তা একটি গোষ্ঠীকে অবৈধ উপায়ে ধনী হবার পথকেই সুগম করেছে।[৭]

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর জাতীয়করণের নেতিবাচক দিকগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর শুরু হয় এবং ৮০ দশকে বিশেষ করে এরশাদ সরকারের আমলে এর প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু হবার পর থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ৬৪০ টি শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এই সমস্ত শিল্প যদি ক্রেতারা নিজ তহবিল থেকে ক্রয় করতো তাহলে না হয় একটা সান্ত্বনা ছিল। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে রাষ্ট্রীয় কারখানার সম্পদ আত্মসাৎ করে যে শ্রেণীটি অগাধ সম্পদের মালিক হন তারাই পরবর্তীকালে সরকারী শিল্প নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করেন।[৮]

এই ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণও সরবরাহ করা হয়। এই তথাকথিত শিল্পপতিদের উদ্যোক্তা হিসেবে কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা, কিংবা উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের দক্ষতা আছে কিনা অথবা প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব কতটুকু সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনি ঢালাওভাবে অপরিকল্পিত শিল্পায়নের পরিণতিতে দেশ এখনও শিল্প ক্ষেত্রে গতিশীলতা লাভ করতে পারে নাই। অর্থাৎ শিল্প প্রকল্পে সরকারী অনুমতি ও সহযোগিতা মিলেছে ঠিকই কিন্তু একজন উদ্যোক্তা কোন অবস্থায় ঝুঁকি গ্রহণে উদ্যোগী হয় কিংবা কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা শিল্প উদ্যোক্তার বিকাশে সহায়ক হবে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণায় হাত দেয়া হয় নাই।

শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান থেকেই তথ্য, ধারণা, প্রশিক্ষন এবং অপরাপর সহযোগিতা নিয়েই উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসেন। ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিল্প–উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের উপর পরিচালিত গবেষণায় উদ্যোক্তাগণ শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কিত সহযোগিতাদানে প্রস্তুত এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৮টি সহযোগিতা প্রস্তাবের কতটি সহযোগিতা উদ্যোক্তরা লাভ করেছে তার উপর জরিপ করে শিল্প ইউনিটগুলোর বৈশিষ্ট চিহ্নিত করা হয়। উক্ত সহযোগিতা প্রস্তাবগুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্র বিষয়কঃ[৯]

১) প্রকল্প চিহ্নিত করণ, ২) সম্ভাব্যতা যাচাই, ৩) প্রকল্পের প্রস্তুতি, ৪) রেজিষ্ট্রেশন, ৫) প্রকল্পের জমি বা দালানকোঠা, ৬) শিল্পের সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি প্রাপ্তি, ৭) বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সহায়তা দান, ৮) শিল্প স্থাপন ও বিন্যাস, ৯) প্রয়োজনীয় স্টাফ সংগ্রহ, ১০) উদ্যোক্তা ও স্টাফদের প্রশিক্ষন, ১১) পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ১২) দুস্প্রাপ্য কাঁচামালের ব্যবস্থা, ১৩) উৎপাদন ও পণ্যের গুণগতমান নির্ণয়ে সহযোগিতা, ১৪) পণ্যের বাজারজাতকরণে সহযোগিতা, ১৫) ইনসেনটিভ ও রিলিফ, ১৬) ব্যবস্থাপনা এবং কনসালটেনসি, ১৭) সাধারণ সহযোগিতা, এবং ১৮) অন্যান্য।

উপরে উল্লেখিত সহযোগিতা প্রসংগে বিভিন্ন উদ্যোক্তার সাথে যোগাযোগ করে গবেষকগণ জানতে পারেন উদ্যোক্তারা উক্ত ১৮টির মাত্র ৬টিতে সহযোগিতা লাভ করেছেন। যেমনঃ অর্থ সংক্রান্ত, শিল্পের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, রেজিষ্ট্রেশন, জমি বা দালানকোঠা, দুস্প্রাপ্য কাঁচামাল এবং বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ সংক্রান্ত। খুব অল্প সংখ্যক উদ্যোক্তাই প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্পের প্রস্তুতি ও শিল্প স্থাপন ও বিন্যাসকরণ সম্পর্কিত সহযোগিতা পেয়েছে। অপরদিকে প্রয়োজনীয় স্টাফ, উদ্যোক্তার নিজের ও স্টাফদের ট্রেনিং, পণ্যের মান নির্ণয় ও বাজারজাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন সহযোগিতাই অর্জন করে নাই।[১০] প্রায় এক দশক পূর্বে এই গবেষণা পরিচালিত হলেও আজকেও উক্ত গবেষণায় উল্লেখিত সমস্যার কোন হেরফের হয় নাই। ১৯৯০ সালে উত্তরাঞ্চলীয় শিল্পের উপর এক গবেষণায়[১১] দেখা গিয়েছে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিতে উদ্যোক্তাদের পুর্ব অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, বাজারজাত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নাই। উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্প শুরু করেন। এই অর্থ মূলত জমি, দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী সম্পত্তি খাতে ব্যয়িত হয়। অপরদিকে চলতি মূলধন, কাঁচামাল, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের স্টক ইত্যাদির জন্য ব্যাংকের ঋণ নিতে হয়। অনেক সময় ব্যাংক থেকে ঋণদান প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা কিংবা চলতি মূলধন না পাওয়ার জন্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। উৎপাদন না হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকের বেতন, বিদ্যুত খরচ, ঋণের সুদ প্রদান ও কাঁচামালের ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট নিরসনেই উদ্যোক্তাকে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হয়। এছাড়াও দেখা যায় মালিক নিজেই কারখানা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। ঢাকা থেকে দূর দূরান্তে অবস্থিত যেমন রংপুর, দিনাজপুর বা অপরাপর স্থানের উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ মেয়াদী

ঋণ, রেজিষ্ট্রেশন, আমদানী লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে প্রায়শই ঢাকায় আসা–যাওয়া করতে হয়। অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন কারখানার কোন কোন কাজ বন্ধ রেখে ঢাকায় অবস্থান করতে হয়। এতে অর্থ ও সময় দুইই অপচয় হয়।

শিল্প– উদ্যোগ গবেষণায় যে বিষয়গুলি সংযোজন প্রয়োজন তাহলো – প্রতিযোগিতা এবং সম্ভাব্য বাজার, ব্যয়, ব্যয় সংকোচন পদ্ধতি, কারখানার ন্যূনতম আয়তন এবং এলাকা ভিত্তিক শিল্প প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদি। শিল্প–উদ্যোক্তারা এ সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ঠ সচেতন নন। যদিও ইদানীং শিল্প সম্পর্কিত গবেষণায় কিছু তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে বিশেষ করে অপরিকল্পিত এবং ঢালাওভাবে উদ্যোক্তার গুণাগুণ বিবেচনায় না এনে শিল্পের অনুমতি দেওয়ার ফলেই যে আজ অনেক শিল্প রুগ্ন শিল্পে পরিণত তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে শিল্পায়নে গতিশীলতা আনতে গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, এগুলি হলোঃ[১২] (১) শিল্প–উদ্যোগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষন, (২) সম্ভাব্য শিল্প–উদ্যোক্তা চিহ্নিত করার মাপকাঠি, (৩) শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ একত্রিকরণ, (৪) প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানে উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ, ৯৫) শিল্প–উদ্যোক্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমের ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান।

এখানে উল্লেখযোগ্য, অতীতে বিভিন্ন গবেষণায় আর্থিক সহায়তার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। আর্থিক সহায়তা নিঃসন্দেহের গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় অনেক সফল উদ্যোক্তাও প্রয়োজনীয় সময়ে ঋণ বা ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল না পেয়ে কারখানা দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। কিন্তু আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষন, প্রকল্প নির্বাচন, বাজারজাতকরণ, ঝুঁকি গ্রহণ, অঙ্গীকার ইত্যাদির অভাবও শিল্পের বিকাশের অন্যতম অন্তরায়। অনেক উদ্যোক্তাই শুধুমাত্র আর্থিক সমস্যাকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু ঋণ পেয়েও দেখা যায় উপরোল্লিখিত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষন ও দক্ষতার অভাবে প্রকল্প অচল হয়ে পড়ে। আর প্রকল্প অচল হয়ে পড়েছে আঁচ করতে পেরেই প্রাপ্ত ঋণের টাকা অন্য ব্যবসায়ে স্থানান্তর করে কারখানা দেউলিয়া ঘোষণা করে দেয়। এতে অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এ ধরনের উদ্যোক্তা শিল্পায়নের পরিবেশ সৃষ্টিতেও অন্তরায় সৃষ্টি করে।

প্রযুক্তি গবেষণা

প্রযুক্তির বিকাশ ও শিল্পোন্নয়ন একে অপরের উপর নির্ভরশীল। শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে প্রযুক্তির প্রসার ঘটে আর প্রযুক্তির প্রসারের অর্থই হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। "প্রযুক্তি হচ্ছে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা পদ্ধতিগত জ্ঞানের সেই ক্ষেত্র যা উপকরণ ও সেবার সুষ্ঠু নকশা ও উৎপাদনকে নিশ্চিত করে। এই প্রযুক্তি যখন বিজ্ঞান সম্মত গবেষণামূলক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে হয় তখন তা প্রকৃতই কার্যোপযোগী হয়ে ওঠে। আর এভাবেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার

ফলাফল হিসেবে `know-how' ও `know-why' এর মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।"[১৩] এই ভিন্নতা নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে উৎসাহ যোগায় যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের বৈচিত্র এনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। একজন উদ্যোক্তার জন্য প্রযুক্তির পাশাপাশি তিনটি কাজ যুক্ত হয়।[১৪] প্রথমত, বিদ্যমান কারিগরী সচেতনতার মান বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত, লাগসই যন্ত্রপাতি ও কৌশল সংগ্রহ করা; এবং তৃতীয়ত, কারখানার প্রযুক্তির যথাযথ মান নিশ্চিত করা। প্রযুক্তি নির্বাচনের পূর্বে প্রযুক্তির দক্ষতা, উৎপাদন ক্ষমতা এবং তার সাথে চাহিদার সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, প্রযুক্তির আবেদন সর্বজনীন হলেও দেশ, কাল, অবস্থাভেদে তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন নয়। অর্থাৎ কোন প্রযুক্তি ফ্রান্সে যে উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করবে আমাদের দেশেও একই পরিমাণ করবে তার নিশ্চয়তা নাই। কেননা, প্রযুক্তি সৃষ্টি হয় প্রায়োগিক সমস্যা থেকে। এই প্রায়োগিক সমস্যা এক এক দেশে একেক রকম।[১৫] ফ্রান্সে আবিষ্কৃত প্রযুক্তির উৎপাদনশীলতা সৃষ্টির পিছনে যেভাবে উপকরণ, দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা আর প্রশিক্ষনের নিশ্চয়তা দেয়া হয় তার ঘাটতি থাকা স্বাভাবিক। ফলে বাংলাদেশে ঐ প্রযুক্তির উৎপাদন ক্ষমতার কম ব্যবহৃত হবে। উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার না হলে প্রযুক্তির সংরক্ষণ খরচ বেড়ে গিয়ে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। কাজেই প্রকল্পের অনুমতি দেয়ার পূর্বে প্রযুক্তি নির্বাচনের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও প্রযুক্তির জন্য পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল। শিল্পের উন্নয়নে যে প্রযুক্তি দেশে তৈরী সম্ভব নয় কিংবা ব্যয়বহুল তা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে যা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রযুক্তি আমদানীর পূর্বে জানা প্রয়োজন প্রযুক্তির উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সম্ভব কিনা। কিন্তু প্রযুক্তি আমদানীর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই এই বিষয়গুলির গুরুত্ব দেয়া হয় না। প্রযুক্তি নির্ধারণে থাকে সাহায্য–দাতা দেশগুলির চাপিয়ে দেয়া শর্ত এবং তাদের সহযোগী হিসেবে এদেশীয় কিছু ব্যক্তিবর্গ যাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। এমনকি প্রযুক্তি নির্ধারণে দেশের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ব্যতিরেকেই তা করা হয়। এই নির্ধারিত মেশিনপত্রের নকশা, গঠন প্রক্রিয়া ইত্যাদির সাথে দেশীয় প্রযুক্তিবিদদের সংযোগ থাকে না। ফলে মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত যন্ত্রাংশ আমাদের দেশে তৈরী জটিল হয়ে পড়ে এবং বিদেশ থেকে বিপুল ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ না আনা পর্যন্ত মেশিন বন্ধ থাকে, উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং এমনিভাবেই কারখানা লোকসানের সম্মুখীন হয়।[১৬] আসলে প্রযুক্তি আমদানীতে দেশীয় কিছু ব্যক্তিবর্গের কমিশন প্রাপ্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অপেক্ষাকৃত পূঁজিঘন প্রযুক্তির রক্ষণাবেক্ষন ও অবচয়জনিত খরচ থেকে বেশী আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। ঠিক একই কারণে কারখানার প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণেও দেশীয় প্রযুক্তিবিদদের অবহেলা করা হয়।[১৭] দেশের অর্থনীতি অধিক

মাত্রায় বিদেশ নির্ভরতার কারণে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন গবেষণাও উপেক্ষিত। ফলে দেশের চাহিদা মোতাবেক প্রযুক্তির বিকাশ হচ্ছে না। মৌলিক ও বৃহৎ শিল্পের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন এবং তার জন্য বিদেশের উপর স্বাভাবিককারণেই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু সে প্রযুক্তি দেশীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি যেহেতু পুঁজিঘন ও শ্রমনিয়োজন ক্ষমতা কম, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা হ্রাস করার জন্য শ্রমঘন প্রযুক্তির উপর জোর দেয়া আবশ্যক। শ্রম নিয়োজনের দিক দিয়ে এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আজ শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত মোট শ্রম শক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত আছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে। শুধু তাই নয় দেশের ভোগ্য পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ খাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তেমন উল্লেখযোগ্য তৎপরতা লক্ষণীয় নয়। দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে সরকার কর্তৃক পরিচালিত দুইটি প্রতিষ্ঠান, আনবিক শক্তি কমিশন ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেণনা পরিষদ (বি, সি, এস, আই, আর)এর মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রধানত দেশে শিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল ব্যবহারের প্রযুক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত। এছাড়াও কিছু কিছু আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান আছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তার অভাব ছাড়াও কর্মকান্ডে সমন্বয়ের অভাব এবং সীমিত সুযোগ–সুবিধার কারণে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতাও উল্লেখ করার মতো নয়।

প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণার আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে পাট থেকে জুটন আবিষ্কার শিল্প ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত পণ্যের উন্নয়নে গবেষণা তেমন অগ্রসর হয়নি। অথচ দেশের বৃহত্তম শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার আজ কৃত্রিম বিকল্প পন্যের কারণে হুমকির সম্মুখীন। তাই পাট থেকে নতুন পণ্য আবিষ্কারের গবেষণা সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তেমনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তির বিকাশে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন আবশ্যক। এক্ষেত্রে বুয়েট (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি)– এ সদ্য প্রতিষ্ঠিত লাগসই প্রযুক্তি ইনিস্টিটিউটকে আরও সম্প্রসারিত করে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া একান্ত জরুরী।

বাজারজাতকরণ

শিল্পোন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সম্প্রসারিত বাজার। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বাজার। কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ বাজারই একটি দেশের শিল্পকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে। রপ্তানী বাজার তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ও অনিশ্চিত, যদিও রপ্তানী বাজারের প্রতিযোগিতা পণ্যের মান উন্নয়নে এবং উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তবুও শুধুমাত্র রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দু–একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন দেশই শিল্পোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয় নাই।[১৮] পণ্যের বাজার

সম্প্রসারণের অর্থ উৎপন্ন পণ্য বা সেবা সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি প্রাপ্ত চাহিদা উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহকে উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য করে। আর উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির অর্থই বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি।[১৯] অর্থাৎ বাজারের ওঠানামাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির গতি–প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। কাজেই প্রকল্প বাস্তাবায়নের পূর্বে পণ্যের বাজারজাত করণের বৈশিষ্ট অনুসারে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এ ধরনের বিভাজন পণ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাতে সাহায্য করে। পণ্যের হ্রাস–বৃদ্ধি কোন সামাজিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক কারণে ঘটে যাওয়া (অনুকূলে বা প্রতিকূলে) কোন ঘটনার কারণে ঘটে যেতে পারে। যদি এই সম্পর্কের সত্যতা যাচাই সম্ভব হয় তাহলে চাহিদা হ্রাস কিংবা বৃদ্ধির উপর পূর্বেই আভাষ দেয়া যেতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন বাজার ব্যবস্থায় সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ, চাহিদার গতি–প্রকৃতি, বিভিন্ন মৌশুমকে কেন্দ্র করে পণ্যের চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে সৃষ্ট সম্পর্ক।

আমাদের দেশে দারিদ্রই শিল্প পণ্যের বাজার সংকুচিত করে রেখেছে। এই সংকুচিত বাজারের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে বিদেশী পণ্য যার ক্রেতা শহরের উচ্চ আয়ের লোকেরা। শহরের উচ্চ আয়ের লোকদের ভোগ বাজেটের ৪০ শতাংশ আমদানী পণ্য নির্ভর। সে তুলনায় গ্রামীন দরিদ্র পরিবারগুলির এই নির্ভরশীলতা মাত্র ১৪ শতাংশ।[২০] অর্থাৎ দেশীয় পণ্যের ক্রেতা গ্রামীন জনগণ কিন্তু এই গ্রামীণ জনগণের আয় কৃষি উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির সাথে শিল্প পণ্যের চাহিদা ওঠা–নামা করে। তাছাড়া গ্রামীন ও ছোট় শহর এলাকায় উদ্যোক্তাদের বাজার সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ভোগ্য পণ্য শিলপ ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই সমস্ত এলাকায় উদ্যোক্তারা পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য স্থানীয় পাইকারী বিক্রেতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পাইকারী বিক্রেতা অধিকাংশ সময়ই নগদ অর্থে ক্রয় না করে খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত পুঁজি আটকে রাখে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ ব্যবসায়ীদের কাছে আটকে থাকে। অপরদিকে ব্যাংকের সুদ বাড়তে থাকে। ঢাকায় ইসলামপুর, তাঁতী বাজারে পাইকারী ব্যবসায়ীরা নগদ মূল্যে যেভাবে শিল্প পণ্য ক্রয় করেন (তেমনি চট্টগ্রাম–এ) এ ধরনের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মফস্বল এলাকায় এমনকি অপেক্ষাকৃত বড় শহরেও না থাকায় উদ্যোক্তরা আর্থিক সংকটে পড়েন। এই সমস্যা উত্তরণে কিংবা স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণে কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই।

কোন পণ্যের বাজারজাতকরণের পূর্বে বাজার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা আবশ্যক। পণ্যের বিক্রয় অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য পণ্যের বাজারস্তর, প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে জনগণের ধারণা, বিক্রয় সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাজার সম্পর্কিত গবেষণায় যা অন্তর্ভূক্ত থাকা প্রয়োজন তা হলোঃ

(১) বাজারে একই পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য আছে কিনা; থাকলে তার চাহিদা;

(২) চাহিদা অধিক কিন্তু উক্ত উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত রাখার দরুন সরবরাহ কম বা বেশী কিনা;

(৩) পণ্য ক্রয়–বিক্রয় সরাসরি পাইকারী; না খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে;

(৪) পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে কিনা; থাকলে কতটুকু কার্যকর;

(৫) জনসাধারণের আয়ত্তর।

ব্যবস্থাপনা

শিল্পের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপরে। কাঁচামাল ক্রয় থেকে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে প্রক্রিয়াজাতসহ যাবতীয় কাজ পরিচালনা ব্যবস্থাপনার অন্যতম দায়িত্ব।[২১] ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে আর্থিক হিসেবের তথ্যাবলী। শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও সমস্যা, বিশেষ করে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও পণ্যের চাহিদা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এ ছাড়া পণ্যের মান উন্নয়ন, পণ্য সংরক্ষণ ইত্যাদিও ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদন শুরুর সিদ্ধান্ত থেকে বিপনন পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্য ভাষায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান কিংবা সম্প্রসারণ অথবা সংকোচন অনেকাংশেই নির্ভর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক লাভজনক শিল্পও লোকসানে পরিণত হতে পারে। আবার অনেক অলাভজনক শিল্পও লাভজনক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কোন শিল্পোদ্যোক্তা যখন পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি নেয় তখন পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপরকণের দাম অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় নির্দিষ্ট থাকলেও বিক্রয় মূল্য থাকে অনিশ্চিত।[২২] অর্থাৎ বাজারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। যদি প্রচলিত বাজারে দামে (প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে দামে অপর উদ্যোক্তারা একই পণ্য বিক্রি করছে) মুনাফা লাভের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে উৎপাদন খরচ হ্রাস প্রয়োজন। তার জন্য শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কাঁচামালের অপচয় রোধ, উৎপাদনে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি প্রক্রিয়া ভিত্তিক বিন্যাস করা, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। আর যদি পণ্যের নিম্নমানজনিত কারণে চাহিদা হ্রাস পায় তাহলে পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণের ত্রুটি বিশ্লেষণ জরুরী। এ ক্ষেত্রে যখনই উৎপাদিত পণ্যমানে তারতম্য পরিলক্ষিত হবে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হবে তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ায় ত্রুটি বের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[২৩] অনেক সময় পণ্যের গুণাগুণ কাঁচামালের উপর নির্ভর করে। যদি কাঁচামালের নিম্নমানের কারণে পণ্যের মান খারাপ হয় তাহলে একই পণ্যের লট থেকে

দৈবচয়ন (Random Process) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয় যায়।[২৪]

এ ছাড়াও প্রযুক্তিগত মান, যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি পরীক্ষাও ব্যবস্থাপনার আওতায় পড়ে। অর্থাৎ কারখানার লাভ লোকসানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা জড়িত। লোকসান হলে তার কারণ খুঁজে বের করে দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া আর লাভ হলে তা ধরে রাখা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জাতীয়করণকৃত শিল্পে লোকসানের অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম ছিল অদক্ষ ব্যবস্থাপনা। অনভিজ্ঞ, অদক্ষ এবং প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকেই ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কারণে কারখানা লাভজনক হতে পারেনি। পরবর্তীতে কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের পরেও ব্যবস্থাপনায় উন্নত কৌশল গৃহীত হয় নাই। আজও দেশের সরকারী কি ব্যক্তি মালিকানায় উভয় ক্ষেত্রেই শিল্প কারখানার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিল্প ইউনিট আজ রুগ্ন। আজও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা তার অন্যতম কারণ। তাছাড়া চোরাচালানের মাধ্যমে আসা পণ্য আজ দেশীয় শিল্প বিকাশের অন্যতম অন্তরায়। সেই সাথে আছে আমদানীকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা। চোরাচালানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়াও দেশীয় পণ্যের মান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ হ্রাস জরুরী। এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন আবশ্যক।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য কোন নির্দিষ্ট ধারণা বা অনুমানের সত্যতা যাচাই করা এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা। এই উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে। উৎসগুলিকে মুলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

(১) প্রাথমিক উৎস (Primary source), যা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বলা হয় প্রাথমিক তথ্য বা উপাত্ত;

(২) মাধ্যমিক উৎস (Secondary source), যা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বলা হয় মাধ্যমিক উপাত্ত বা তথ্য।

যে সমস্ত তথ্য গবেষণার প্রয়োজনে মূল উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিক তথ্য বলে। এ ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধানে মূল কারখানায় বা বাজারে কিংবা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি গিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।[২৫] অপরদিকে মূল উৎস থেকে সংগৃহীত হয়ে কোন সরকারী, বেসরকারী প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কাগজ, জার্নাল বা দলিলে লিপিবদ্ধ আছে সেই তথ্যকে পুনরায় গবেষণার কাজে সংগ্রহ করাকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলে।

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটিঃ

(১) জরিপ পদ্ধতি (Survey Method)

(২) কেস স্টাডি (Case Study)

জরিপ পদ্ধতি : জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যদি দেশের শিল্পের রুগ্নতার কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা পরিচালিত হয় তাহলে শিল্পস্থল পরিদর্শন করে তার কাঠামো, প্রযুক্তি, স্টাফ, কাঁচামালের উৎস ও বাজারের অবস্থা, শ্রমিকের আয়, উৎপাদনশীলতা, মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে রুগ্নতার কারণ তুলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে যদি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশী এবং বিভিন্ন প্রকারের (আয়তন, পণ্যের আকৃতি, ব্যক্তি মালিকানাধীন, সরকারী, অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পুরাতন) হয় তাহলে গবেষণার ব্যপকতা অনেক বেশী। সে ক্ষেত্রে সাধারণত যৌথভাবে টীম ওয়ার্ক– এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস করা হয়। এই পদ্ধতিতে সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয় যা প্রকৃত কারণ নির্ণয়নে সাহায্য করে। কিন্তু যখন একই ধরনের অসংখ্য শিল্প ইউনিটের উপর গবেষণা পরিচালিত হয় এবং যদি এই ইউনিটগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে সে ক্ষেত্রে নমুনায়ন জরিপ (Sampling Survey) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত উপাদান (ইউনিট) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সেই গবেষণা ক্ষেত্রের সমগ্র উপাদান বা ইউনিটের উপর প্রযোজ্য হয় তাকে নমুনায়ন জরিপ বলে।[২৬] যেমন তাঁত শিল্পের উপর গবেষণা। কোন জেলার তাঁত শিল্পের শ্রমিকদের আয় হ্রাস পাওযার কারণে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর। কেননা উক্ত জেলার ৫০টি গ্রামে হাজার হাজার তাঁতের উপর অনুসন্ধান চালানো অপ্রয়োজনীয়। যেহেতু তাঁত শিল্পের আকৃতি এবং পণ্যের ধরণ একই সেই ক্ষেত্রে ৫০টি গ্রামের পরিবর্তে শুধু ৩টি কি ৪টি গ্রামের উপর অনুসন্ধানেই সমস্যার কারণ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এই পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু অসুবিধা হলো এই ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় দলিল অনেক সময় পাওয়া যায় না। এছাড়া অল্প সংখ্যক বিষয়ের উপর অনুসন্ধান করে সামান্যকরণ (Generalization) করা হয় বলে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

কেস স্টাডি : এই পদ্ধতিতে কোন একটি বিষয়, প্রতিষ্ঠান বা দলকে গবেষণা ইউনিট ধরে তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে একটি ধারণার যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান করা হয়। এখানে নির্ধারিত বিষয় যাতে প্রতিনিধিত্বকারী এবং সমগোত্রীয় বিষয়গুলির থেকে বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকে তার প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন।[২৭] এই পদ্ধতিতে কোন জটিল বিষয়ের অনুসন্ধান সহজতর। এতে নির্দিষ্ট কোন সমস্যা সম্পর্কে সঠিক চিত্র লাভ করা যায়।

গবেষণার জন্য মাধ্যমিক তথ্য মূলত (যেটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশিত বই, দলিল, অফিস রেকর্ড, প্রতিবেদন, শুমারী ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্যের গুরুত্বও কম

নয়। বিশেষ করে সামগ্রিক স্তরে (Macro Level) এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মোট শিল্প শ্রমিক, তাদের আয়, আমদানী রপ্তানীতে শিল্পের ভূমিকা, বিনিয়োগ, জাতীয় আয় ইত্যাদির জন্য মূলত মাধ্যমিক তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

উপাত্ত সংগ্রহে অসুবিধা

উপাত্ত সংগ্রহে নিম্নলিখিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়ঃ

(১) অনেক শিল্প ইউনিট উপাত্ত সরবরাহে অনীহা প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, ব্যক্তি মালিকানার শিল্প ইউনিটসমূহ উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে বলে এবং এগুলি সাধারণত লিপিবদ্ধ থাকে না আর থাকলেও হস্তান্তর করা হয় না। তাদের আশঙ্কা প্রকৃত মুনাফার কথা বললে অধিক পরিমাণে কর ধার্য্য করা হবে।

(২) সরকারী শিল্প কারখানার লোকসানের কারণ অনুসন্ধানে গেলে অনেক সময় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা নিজেদের ব্যর্থতা চাপা দিতে ভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে।

(৩) অনেক শিল্প ইউনিটের বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলি উপাত্ত সংরক্ষণ করে না।

(৪) কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প ইউনিটে শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভয়ে প্রশ্নের প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যায়।[২৮]

(৫) ডাকযোগে তথ্য চাওয়া হলে অনেক সময় জবাব পাওয়া যায় না।

(৬) টীম ওয়ার্কের অনেক সদস্য ঘটনাস্থলে না গিয়েই মনগড়া তথ্য হাজির করে।

(৭) পর্যাপ্ত অর্থাভাবে গবেষণা অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত করতে হয়।

গবেষণার প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য ব্যবস্থাদি

শিল্পায়ন গবেষণায় উল্লেখিত সমস্যা বর্তমান শিল্পায়নের কাঠামোগত দুর্বলতা থেকেই সৃষ্ট। কাজেই সমস্যা সমাধান সামগ্রিক শিল্পায়নের গতিশীলতা আনয়নের সাথেই সম্পর্কিত। তবুও সরকারী সহযোগিতা ও বিশেষ করে গবেষকগণ গবেষণায় আন্তরিক হলে বর্তমান প্রেক্ষাপটেও উপরে বর্ণিত সমস্যা হ্রাস করে শিল্পায়নের বর্তমান অচলবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। এর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

(১) এখানে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও গবেষককে বেশী আন্তরিক হতে হবে। অনেক সময় গবেষকরা সাহায্যকারী নিয়োগ

করেন। এই সমস্ত সাহায্যকারী শিল্প কারখানায় পুর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ছাড়াই তথ্য সরবরাহ করেন যা বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত ফলাফল শিল্পের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে সহযোগী নিয়োগের বেলায় সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং কোন তথ্যের উপর সন্দেহ হলে আবার অনুসন্ধান প্রয়োজন;

(২) কোন বিশেষ শিল্প ইউনিটের উপর গবেষণা চালানোর জন্য সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন। যেমন চিনি শিল্পের উৎপাদন খরচ আন্তর্জাতিক মানের চাইতে বেশী। এর কারণ অনুসন্ধানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কাঁচামাল থেকে শুরু করে চিনি উৎপাদন পর্যন্ত কার্যাবলী দেখা দরকার। অর্থাৎ জমি থেকে কারখানায় আখ আনতে সময়ের পরিমাণ, এই সময় আখ বাইরে থাকার ফলে রসের পরিমাণ কতটুকু কমলো, বিভিন্ন উপাদান মিশ্রণে কারচুপি আছে কিনা, কর্মকর্তাদের উদাসীনতার কারণে লোকসানের পরিমাণ, আমদানীকৃত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের মাত্রা ইত্যাদি। একইভাবে বস্ত্র বা অপরাপর শিল্পেও অনুসন্ধান প্রয়োজন;

(৩) বিভিন্ন শিল্প কারখানায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা তথা বিরোধিতার বিষয়গুলি সরকারের কিম্বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিগোচরে আনা প্রয়োজন। কেননা বিরোধিতা প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে অন্তরায় সৃষ্টি করে শিল্পে লোকসানের বিকৃত কারণ তুলে ধরা হয়।

(৪) শিল্প কারখানায় তথ্য সংরক্ষণে বাধ্য করার জন্য সরকারী নীতিমালা প্রয়োজন। তথ্যের অভাবে উদ্ভূত সমস্যা সরকারের দৃষ্টিতে এনে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে গবেষকদের সুপারিশ করা প্রয়োজন;

(৫) শিল্প, কারখানা তৈরীতে আগ্রহীদের সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ করে অভিজ্ঞ গবেষকদের কাজে লাগানো এবং নতুন শিক্ষার্থী গবেষকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

(৬) সবশেষে গবেষকগণ যাতে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের মান উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করতে পারে তার জন্য সরকারের সহযোগিতাঅপরিহার্য।

উপসংহার

অর্থনীতির জন্য শিল্প খুবই গুরত্বপূর্ণ খাত হলেও আজও আমাদের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান খুবই নগণ্য। ব্যাপক গবেষণার দ্বারা সমস্যা ও সম্ভাবনা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপন এখনও স্বীকৃতি লাভ করেনি। অথচ গবেষণা শিল্পায়নের জন্য

অপরিহার্য। কেননা গবেষণার মাধ্যমে একদিকে যেমন সমস্যাকে সনাক্ত করে বিদ্যমান অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠা যায় তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ যোগায়।

অতীতে শিল্পায়নের কৌশল নির্মাণে গবেষকদের কোন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। স্বাধীনতা উত্তর জাতীয়করণের ফলে সম্ভাব্য দুর্বল দিকগুলির উপর কোন গবেষণা হয় নাই। জাতীয়করণকৃত শিল্পে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা উত্তরণে কোন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় নাই। পরবর্তীতে ঢালাও ভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে কিন্তু যে দুর্নীতির কথা বলে শিল্প কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছে সেখানেও একই দুর্নীতির কারণে শিল্পের প্রসার ঘটতে পারে নাই।

একথা অনস্বীকার্য যে আর্থ–সামাজিক অবস্থার কারণেই আমাদের দেশে গবেষণার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষিত। এখনও অধিকাংশ শিল্প কারখানায় গবেষণা ইউনিট স্থাপন করা হয় নাই। অথচ গবেষণার মাধ্যমেই পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস, পণ্যের বিচিত্রতা বৃদ্ধি, নতুন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ এবং দক্ষ কর্মচারী সৃষ্টি হয়। গবেষণা সম্প্রসারণে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও খুবই অপ্রতুল। শিল্পায়ন গবেষণার জন্য পৃথক বাজেট থাকা প্রয়োজন। অর্থের অভাবে এ যাবৎ যে সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা মূলত দালান কোঠা সর্বস্ব এবং কার্যক্রম বাৎসরিক সেমিনারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে দেশের বিপুল শিক্ষার্থী, গবেষকের মেধা শক্তির অপচয়হচ্ছে।

দেশের অর্থনীতি বিদেশী সাহায্য নির্ভর। এই নির্ভরশীলতা গবেষকদেরকেও প্রভাবিত করছে। সরকারের সহযোগিতার অভাবে গবেষকরা অর্থের বিনিময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদেশী ঋণদানকারী সংস্থার চাহিদা পূরণে।[২৯] কিংবা কিভাবে বিদেশী পণ্যের বাজারজাত হবে, কি কি ধরনের প্রযুক্তি বাংলাদেশে আমদানী করতে হবে সেদিকেই গবেষকরা ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূরীকরণে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশে শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল অধিকাংশ দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্ররা শিল্প কারখানার গবেষণার সাথে যুক্ত আছে। বাংলাদেশেও এই প্রক্রিয়া শুরু হলে শুধুমাত্র দেশের মেধার বিকাশই হবে না শিল্প ক্ষেত্রেও নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটবে।

তথ্য নির্দেশ

১. A. H. M. Habibur Rahman, & Associates, *Entrepreneurship and Small Enterprise Development in Bangladesh.* (Dhaka: Bureau of Business Research, University of Dhaka, 1979.)

২. A. Farouk & Associates, *Lessons from a Biographical Sarvey of Bangladeshi Entrepreneurs,* (Dhaka : Bureau of Business Research. 1983.)

৩. এ, এইচ, এম হাবিবুর রহমান; মোঃ মইনুল ইসলাম; মুঃ আমিরুজ্জামান খাঁন; শহীদ উদ্দীন আহমেদ; আব্দুল মোমিন চৌধুরী; *শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি* (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৮৯)

৪. এ, কে, হিউসেন; এ, কিউ, ক্যানেলা; আ এফ হতাও, অনুবাদ আবু তাহের খান, *শিল্প সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল,* (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল, ১৯৮৮)

৫. মাহবুব হোসেন (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), উদ্ধৃতি ঃ আবু আবদুল্লাহ, "বাংলাদেশের জন্য উপযোগী উন্নয়ন কৌশল", *বাংলাদেশউন্নয়নসমীক্ষা,* ৯ম খন্ড, (১৯৮৮) পৃঃ ৩৪-৩৫

৬. নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা ঃ বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন* ঃ (ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৭) পৃঃ ৪৪।

৭. A. R. Khan and M. Hossain, *The Strategy of Development in Bangladesh* (Macmillan, in Association with the OECD Development Centre, 1989, p. 91.

৮. রেহমান সোবহান এবং বিনায়ক সেন, "উন্নয়ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ সংকটঃ বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বিকাশে সংকট", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* ৬ষ্ঠ খন্ড; (১৯৮৯) পৃঃ ৩৫।

৯. Rahman & Associates, *Ibid,* P. 105.

১০. ঐ

১১. Shafique uz Zaman, "Problems of Industrialization in the Northwest Region of Bangladesh", Bureau of Economic Research, Department of Economics, University of Dhaka, (July, 1991).

১২. রহমানওঅন্যান্য *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫

১৩. হিউসেন ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১০

১৪. ঐ

১৫. অম্লান দত্ত, *উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ* (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃঃ ৩৪

১৬. এম শমসের আলী, *বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চা* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃঃ ১৮

১৭. কয়েক বছর পূর্বে ঘোড়াশাল সার কারখানার সাড়ে তিনশ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পে দেশীয় বিশেষজ্ঞরা দুর্ঘটনার আশংকা করেছিলেন। কিন্তু কমিশন লোভী মন্ত্রী,

আমলাদের চাপে তা অগ্রাহ্য করা হয়। পরে ঐ প্রকল্পে মারাত্মক দুর্ঘটনায় জীবন দিতে হয়েছে বেশ কয়েকজন কর্মচারীকে। সেই সঙ্গে দেশ হারিয়েছে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা।

১৮. যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ঘটেছে। যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিংগাপুর, হংকং। এই দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে। কিন্তু তা ঘটেছে একটি বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের ভৌগলিক এবং সামরিক কৌশলগত দিক রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছে।

১৯. রহমান ও অন্যান্য *প্রাগুপ্ত,* পৃঃ ৩৩

২০. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশ ঃ আত্মনির্ভর উন্নয়নের পথ,* (ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃঃ ১৬

২১. মোঃ বেলায়েত হোসেন, *মৌলিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা,* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমীঃ ১৯৮৯), পৃঃ ২১

২২. রহমান ও অন্যান্য *প্রাগুপ্ত,* পৃঃ ২

২৩. মোঃ বেলায়েত হোসেন, *প্রাগুপ্ত* পৃঃ১৬৪

২৪. ঐ, পৃঃ ১৭৩

২৫. নাজমির নূর বেগম, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি* (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮), পৃঃ ৫৬

২৬. ঐ, পৃঃ ২০৪

২৭. ঐ, পৃঃ ৭৯

২৮. Muhammad Ali Mian, ``Problems in a Survey Research," in : *The Dhaka University Studies*, Part-C, Vol. X, No. 1, (1989), p . 214.

২৯. সাজ্জাদ জহির, "সমাজ গবেষণা ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* ৪র্থ খন্ড (১৯৮৭), পৃঃ ১২৯